মাহরীন ফেরদৌস

জলজ লকার

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

গোলাম কিবরিয়া

শ্রদ্ধাভাজনেষু
যিনি বলতেন, ‘লেখার ভেতরে বেঁচে থাকা যায়।’
আমার স্কুলজীবনের দীর্ঘ ছুটির দুপুরগুলো কেটেছিল তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বইয়ের পাতায় ডুবে।

ভূমিকা

বছর কয়েক আগে উইচিতা আর্ট মিউজিয়ামে নেটিভ আমেরিকান শিল্পী প্রেস্টন সিঙ্গলেটারির অপূর্ব সব সৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে সেই প্রদর্শনীতে যেটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল এবং একই সঙ্গে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল, সেটি ছিল একটি কাচের তৈরি ধবধবে সাদা কাক।

প্রকৃতিতে সব কাকই কালো! তবে প্রেস্টনের কাক কেন সাদা? কৌতূহলী হয়ে ট্যুর গাইডের কাছে জানতে চাইলে সে ডেকে নিয়ে এলো মিউজিয়ামের কিউরেটরকে। কিউরেটর এসে বললেন, পৃথিবীর প্রতিটি শিল্পকর্মের পেছনেই কোনো না কোনো গল্প আছে। সৃষ্টির শুরুতে সব কাক সাদা ছিল, কিন্তু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে, পৃথিবীকে আলোর মুখ দেখাতে অন্ধকারকে সঙ্গী করে নিয়েছে এই পাখিটি। সাদা রং ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে কালোতে।

প্রেস্টনের কাজের অনুপ্রেরণা Tlingit জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। আমার এই উপন্যাস লিখতে বসার সূত্রপাত প্রেস্টনের সেই রহস্যময় আর্ট এক্সিবিশন, যেখান থেকে বাড়ি ফিরে এসে, এক গভীর রাতে, আমি প্রথম খসড়া লিখতে বসেছিলাম। এই বইয়ের একটি অংশে Tlingit জনগোষ্ঠীর মিথ উল্লেখ করা আছে।

বছরখানেকের বেশি সময় ধরে অল্প অল্প করে এই উপন্যাস লিখতে লিখতে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছু বদলে গেছে। ভৌগোলিক ঠিকানা, সম্পর্ক, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস—প্রায় সব কিছুই। শুধু একটি বিষয় কখনো

বদলায়নি। যখনই এই উপন্যাসের ফাইলটি খুলেছি, প্রতিবারই আমি ফিরে গেছি সেই রহস্যময় হলরুমে। পিছু পিছু হেঁটে গিয়েছি আলো-আঁধারে ঢাকা সব শিল্পকর্মের পেছনে। সেই স্মৃতিটুকুই আমাকে জাগতিক জীবনের ক্লান্তিকর দৌড় থেকে ছুটে এসে লেখার টেবিলে ফিরতে বাধ্য করেছে।

এই উপন্যাসে যে গল্পটি বলা হয়েছে, তা কতটা সত্য, কতটা কাল্পনিক—সেই আলাপে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, কোনো কোনো গল্পের আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার অমীমাংসিত রহস্যে। শুধু এটুকুই বলি, কখনো কখনো সেই রহস্যই আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে ওঠে।

আজকের এই ভোগবাদী পৃথিবীতে, যেখানে যুদ্ধ, অশান্তি আর সামাজিক বিভেদ আমাদের প্রতিদিন গ্রাস করছে, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার রিলস আর নোটিফিকেশন আমাদের মনোজগৎকে মুহুর্মুহু দখল করে নিচ্ছে—সেই বাস্তবতার ক্লান্তিকর ভার থেকে যদি এই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলো একজন পাঠককেও সাময়িকভাবে মুক্তি দিতে পারে, অস্থির বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে—তাহলে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

সবশেষে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই 'কথাপ্রকাশ'কে, অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই উপন্যাসটিকে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য।

মাহরীন ফেরদৌস
নিউইয়র্ক
জানুয়ারি ২০২৫

তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষে, অন্ধকার বনে,
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকারব—
বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার মেলেছ বিশাল,
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ?

‘ময়ূর’
উৎপল কুমার বসু

“Stories are for joining the past to the future. Stories are for those late hours in the night when you can’t remember how you got from where you were to where you are. Stories are for eternity, when memory is erased, when there is nothing to remember except the story.”

— Tim O’Brien

১

ঠিক কবে থেকে আমি এই গল্পটা বলার জন্য অপেক্ষা করছি, তা নিজেও জানি না। একবার মনে হয়, আমার জন্মেরও আগে হয়তো এই অপেক্ষা শুরু হয়েছিল। আবার মনে হয়, খুব সম্ভবত সেই দিনটা থেকে আমার গল্প বলতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার শুরু, যে দিনটাকে আমি একবার বা দুবার নয়, বরং ভুলে যেতে চাই হাজার হাজারবার।

সেদিন ছিল জুলাই মাসের দুপুর। তীব্র গরমে সবার গায়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছিল। ঝিমিয়ে পড়া বিষাদে ভরপুর সময়ে আমরা দুই বোন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শিমন চাচাকে নিতে এসেছে দুজন অপরিচিত মানুষ। যাদের চেহারা একবার দেখলে পৃথিবীর যে কেউ আজীবন মনে রাখতে পারবে। কোঁকড়া চুল। ঘন ভুরু। নিখুঁতভাবে মাখন কেটে ফেলার মতো তীক্ষ্ণ নাক আর পরিষ্কার কামানো গাল। যাদের গা থেকে ভুরভুর করে বের হচ্ছে দামি পারফিউমের ঘ্রাণ। তাদের সাজসজ্জা, পোশাক, জুতা—সব কিছুই এমন নিখুঁত যেন দোকানের কোনো চমৎকার ম্যানিকুইন।

আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা শিমন চাচার সাথে কথা বলছে খুব নিচু স্বরে। কিন্তু বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে। যেন বহু বছরের পুরানো বন্ধুকে আজ হঠাৎ ফিরে পেয়ে কেউ নিজের গোপন কোনো তথ্য বলছে।

চাচা যখন লোকগুলোর সাথে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় পাশের বাসার লোকজন আমাদের পিছু নিয়ে বাসার বাইরে চলে এলো। জুলাই মাসের নির্মম রোদ তখন চাবুকের বাড়ি খাওয়া ঘোড়ার মতো আর্তনাদ করছে, আর আগুনঝরা বাতাস হল্কা দিচ্ছে আমাদের চোখেমুখে। এরই মাঝে ধূসর ধুলা উড়ানো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পেলাম প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ শিমন চাচা কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে বাড়ির সামনের পথটা ধরে হেঁটে বড়ো সাদা একটা গাড়িতে উঠছেন।

মাথা নিচু করে গাড়িতে ঢোকার আগ-মুহূর্তে তিনি হঠাৎ করে একটু কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর এমনভাবে একবার পেছনে তাকালেন যেন ভুল করে কিছু ফেলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর, চাচা এক নিমিষে সাদা গাড়ির ভেতরে হারিয়ে গেলেন। আর গাড়িটা চলে যাওয়ার পরপরই রোদ তেতে ওঠা, দম আটকানো দুপুরের গরমে হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে আমাদের সবাইকে একে একে ছুঁয়ে গেল।

আমি চমকে উঠলাম। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল আমি হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি কিন্তু বাতাসের স্পর্শ পেয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। ঠিক তখনই একটা মেহগনিগাছের নিচে এতক্ষণ হতবিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা রিফা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে নিচু স্বরে বলে উঠল,

'বোধহয় খুব দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে...'

২

অরণ্য কিংবা মরুভূমির ভাষা আমার জানা নেই। না জানি নগরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছাপানো অদৃশ্য চিৎকারের শব্দাবলি। অনেক কিছুই জানি না, জানতে ইচ্ছেও করে না। কিন্তু তারপরও বহুদিন পরে যখন শুনলাম তালিসমান এই শহরে আবার ফিরে এসেছে তখন আমার বুকের ভেতরটুকু একই সাথে শীতল ও উষ্ণ হয়ে উঠল। আমার দু হাতের তালু ঘেমে উঠল। মনে হলো, আমি কোনো পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। একা। কিন্তু তারপরও ঠিকই অনুভব করতে পারছি এই শিহরিত নির্জনতার মাঝেও কোথায় যেন তালিসমানের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি আছে।

তালিসমানের ফিরে আসার কথাটা আমাকে জানিয়েছিল মারিয়া। যদিও বেশ অনেক বছর হলো ও নিজের নাম বদলে ফেলেছে। সবাই ওকে এখন ডাকে অ্যাঞ্জেল এম। ওর হোটেলের নামে নাম। এই ছোটো শহরের সবচেয়ে বড়ো হোটেল ওর। যেখানে দেশের ও দেশের বাইরে থেকে ক্ষমতাশীল ও প্রতাপশালী মানুষরা এসে থাকে। বড়ো বড়ো রাস্তা বা হাইওয়েতে যাওয়ার আগে যে-কোনো মানুষের চোখের তারায় অ্যাঞ্জেল এম হোটেলের অতিকায় ও উজ্জ্বল বিলবোর্ড দেখা যায়। শুধু তাই না, এলাকার রেস্তোরাঁগুলোতে নাশতা কিংবা রাতের খাবার খেতে গেলেও টিভিতে চলতে থাকে বিজ্ঞাপন। সেখানে দেখা যায়, পেছনে

নীল আকাশ রেখে, অতিকায় কিছু বিল্ডিংয়ের সামনে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ছোটোখাটো উচ্চতার এক মহিলা। যার গায়ে সাদা-কালো স্ট্রাইপের ঢোলা প্যান্ট ও সাদা টপ। মাথায় টকটকে লাল রঙের বাহারি টুপি। স্লো মোশনের ড্রোন শটে যাকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখা যাবে হোটেলের দিকে। সাথে সাথেই জমকালো মিউজিকের সাথে ভেসে আসবে আকর্ষণীয় কণ্ঠের ভয়েস ওভার।

"এই শহরে আমার জন্ম। এখানেই বেড়ে উঠেছি আমি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে খুঁজে এনেছি শহরের সেরা সব কিছু: মুখরোচক খাবার, আরামদায়ক রাতযাপন, আড্ডা ও ড্রিঙ্কসের জমজমাট সন্ধ্যা, সাথে আরও বহু কিছু। যদি আপনি খুঁজে থাকেন অসাধারণ ও নিখুঁত কোনো জায়গা—একটু নিরিবিলি অথচ দুর্দান্ত মুহূর্ত! তাহলে angelm.club আপনার জন্যই! এই সেই জায়গা, যা দুনিয়ার অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না।

নিজের জন্য 'পারফেক্ট' কিছু খুঁজে নিতে এখনই ফোন করে দেখুন ৩১৬৩১৬ নম্বরে, অথবা সরাসরি ভিজিট করুন www.angelm.club"

বিজ্ঞাপনের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, মারিয়ার মাথায় হ্যাটের ওপরে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ভেসে উঠছে এবং নিচে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা, 'এখনই বুক করুন।' সব মিলিয়ে নার্সিসিজম ও ড্রামায় ভরপুর, বিচ্ছিরি একটা বিজ্ঞাপন। তবে এখানে অন্য কোনো মডেল না রেখে নিজেকে রাখার ব্যাপারে মারিয়া বেপরোয়া থাকলেও ভয়েজ ওভারে ও নিজের কণ্ঠ দেয়নি। লোকাল রেডিয়োর সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্টিস্টকে ভাড়া করেছিল। খুবই নকল ও হাস্যকর লাগছিল ওর চেহারার সাথে সেই কণ্ঠস্বরটা। কিন্তু তাতে মারিয়ার কিছুই যায়-আসে না। পুরো বিজ্ঞাপনটা নিয়ে ও ছিল অসম্ভব গর্বিত। আর আমরা ছিলাম বিরক্ত।

তবে এ নিয়ে কিছু বলার উপায় ছিল না। কারণ, মারিয়ার দিকে তর্জনী তোলার মতো সাহস এখানে কেউ রাখে না। যদিও এককালে এই ওকে উৎপাত করেনি এমন কোনো ছেলে এই এলাকায় ছিল কিনা সন্দেহ আছে। কলেজে পড়ার সময় ওর প্রেগন্যান্সির কথা অনেকে

জেনে যাওয়ার পর, ছেলেরা ধরেই নিয়েছিল মারিয়ার মতো সহজলভ্য মেয়েকে চাইলেই যা ইচ্ছে তাই বলা যায়। নিয়ে যাওয়া যায় বিছানায়।

অল্প কিছু মানুষ বাদে; ওর পালিয়ে যাওয়া প্রেমিক আমিনকে নিয়ে কেউ তেমন কিছু বলেনি। অন্য শহরে চলে যাওয়ার বেশ কিছু বছর পর আমিন যখন স্ত্রীসহ ফিরে এসেছিল তখন সবাই এমনভাবে ওদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল যেন ওরা দুজন কোনো তীর্থস্থান দর্শন করে এসেছে। আমিনের ফিরে আসার খবর জানামাত্রই মারিয়া ছুটে গিয়েছিল দেখা করতে। লোকে বলে, আমিন তখন মাত্র ওর এক প্রতিবেশীর খোলা বারান্দায় নতুন স্ত্রীসহ চা-নাশতা খেতে বসেছে। এমন সময় সেখানে অস্থির ভঙ্গিতে এসে হাজির হলো মারিয়া। মারিয়াকে দেখামাত্র আমিনের চেহারা কেমন হয়েছিল আজও তা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি। ও কি আদৌ সে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল যে উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসা ওর প্রাক্তন প্রেমিকা কোনো পুরানো দাবি-দাওয়া নিয়ে আসেনি, বরং বেশ কিছু মানুষের সামনে ওকে সশব্দে একটা চড় মারতে হাজির হয়েছিল?

পূর্বপাড়ার ভূতুড়ে বাড়িতে একা বসবাস করা পঁচাত্তর বছরের বুড়ো মির্জা এই ঘটনা শুনে খুবই মজা পেয়েছিল। সকাল বেলা লাঠি হাতে হাঁটতে বের হয়ে পাড়ার দোকানগুলোতে সে থামত। আর খকখক করে কাশতে কাশতে রসিয়ে রসিয়ে এই গল্প বলে বেড়াত সবাইকে। তারপর গল্পের উপসংহার হিসেবে মুখ করুণ করে বলত, 'মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচুম না। রক্তবমি হয়।' দোকানিরাও এই কথা শুনে আশার বাণী দেওয়ার বদলে, বুড়োর শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁকে মনে করিয়ে দিত, দুনিয়াটা আসলেই দুই দিনের খেলা। আর কিছু না।

চড় মেরে আসার পর আমিন আর ওর স্ত্রী যে কটা দিন এখানে ছিল সেই দিনগুলোতে মারিয়া ওর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া হোটেলের লবিতে বসে থাকত। খাওয়াদাওয়া কিংবা বাজার করার জন্যও বের হতো না। শুধু রাত গভীর হলে ওকে একা একা সিগারেট হাতে বাড়ি ফিরতে দেখত হোটেলের নাইটগার্ড। এককালে সাড়ে পাঁচ মাসের

একটা মৃত বাচ্চা জন্ম দেওয়া সেই মারিয়া এখন কত বদলে গেছে! শুধু নামেই অ্যাঞ্জেল যুক্ত হয়েছে। ভেতরে ভেতরে ও এখন সাক্ষাৎ শয়তান। যাকে আর আগের সাথে মেলানো যায় না। শিমন চাচা চলে যাওয়ার অনেক দিন পরে আমাদের এক প্রতিবেশী প্রায় নিশ্চিত হয়ে বলেছিল, চাচাকে নিতে আসা ওই অদ্ভুত লোকগুলো সচরাচর এসে ওর হোটেলেই থাকে। এছাড়া কেউ কেউ শহরের শেষপ্রান্তে থাকা ওর বাকি দুটো মোটেলেও আসর জমায়। দেখতে ছোটোখাটো মারিয়ার ক্ষমতার শিকড় হয়তো দৈর্ঘ্যে এই শহরের চেয়েও বড়ো। ওর চারপাশে শুধুই রহস্যময় অন্ধকার, আর গাঢ় ধোঁয়া। যেখানে নিঃশব্দে আততায়ীর মতো ঘুরে বেড়ায় কিছু মানুষ। যাদের আমরা কেউ চিনি না।